Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIV, Issue-IV, July 2026, Page No. 01-11
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.14.issue.04W.111

শেখর দেবরায়ের 'মনসাকথা' নাটকে নিম্নবর্গের মানুষের কণ্ঠস্বর: একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ড. সুপ্রিয়া দাস, *সহযোগী অধ্যাপিকা ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, রামঠাকুর কলেজ, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা, ভারত*

দীপক দে, *অতিথি প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, রামঠাকুর কলেজ, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা, ভারত*

Received: 09.07.2026; Accepted: 18.07.2026; Available online: 31.07.2026
©2026 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This paper offers a sociological reading of Shekhar Debroy's Mansakatha, examining how the play foregrounds the voices, struggles, and cultural identity of subaltern communities. Reinterpreting the traditional Manasamangal narrative, Debroy transforms the conflict between Goddess Manasa and Chand Sadagar into a symbolic struggle between the marginalized and the dominant social order. Chand Sadagar represents upper-caste, patriarchal, and hegemonic power, while Manasa emerges as the embodiment of oppressed communities, women, and neglected social groups seeking dignity and recognition. Through the experiences of boatmen, labourers, and other marginalized characters, the play exposes exploitation, caste discrimination, economic inequality, and cultural exclusion. The study further demonstrates how Debroy employs folk language, regional dialects, songs, and indigenous theatrical conventions to preserve the lived experiences and collective consciousness of subaltern people. Rather than presenting Manasa merely as a mythological deity, the play reconstructs her as a symbol of resistance, social justice, and cultural assertion. The eventual acceptance of Manasa, though partial and reluctant, signifies a symbolic challenge to entrenched structures of domination and the beginning of social transformation. Thus, Mansakatha transcends the boundaries of mythological drama and becomes a powerful socio-political text that articulates the aspirations, agency, and identity of marginalized communities within the broader discourse of caste, gender, class, and power in Bengali literature.

Keywords: Mansakatha, Shekhar Debroy, Subaltern Studies, Marginalized Communities, Caste and Class, Folk Theatre, Manasa Myth, Patriarchy, Social Resistance, Sociological Analysis

(১)

> "চিরকালেই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন, তাদের মানুষ হবার সময় নেই; সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। সবচেয়ে কম খেয়ে, কম পরে, কম শিখে, বাকি সকলের পরিচর্যা করে; সকলের চেয়ে বেশি তাদের পরিশ্রম; সকলের চেয়ে বেশি তাদের অসম্মান। কথায় কথায় তারা রোগে মরে, উপোষে মরে, উপরওয়ালাদের লাথি ঝাঁটা খেয়ে মরে– জীবন যাত্রার জন্য যত কিছু সুযোগ সুবিধে সবকিছু

থেকেই তারা বঞ্চিত। তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাঁড়া দাঁড়িয়ে থাকে- উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে...।"[১]

— এই অনগ্রসর, পিছিয়ে পড়া, নিষ্প্রভ 'সভ্যতার পিলসুজ'রা হল সমাজের নিম্নবর্গীয় শ্রেণির মানুষ। এই নিম্নবর্গীয়রা হল সমাজের সেই সকল মানুষ যারা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে ক্ষমতাকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থার দ্বারা শোষিত, বঞ্চিত, অবহেলিত। সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ, কৃষক, দিনমজুর, জেলে, মাঝি, মোল্লা, চামার, মুচি, মেথর— সকলেই নিম্নবর্গীয় শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। ইতিহাসবিদ রঞ্জিৎ গুহের মতেও—

"শহরের শ্রমিক ও গরিব, সর্বোচ্চ পদের আমলাদের বাদ দিয়ে মধ্যবিত্তের বাকি অংশ, গ্রামের খেতমজুর, গরিব চাষি ও প্রায়-গরিব মাঝারি নিম্নবর্গের মধ্যে গণ্য।"[২]

নিম্নবর্গ শব্দটি বাংলা ভাষায় আমদানি হয়েছে ইংরেজি সাবলটার্ন (Subaltern) থেকে। ইতালীয় দার্শনিক আন্তেনিয় গ্রামসি তাঁর কারাগারের নোটবই গ্রন্থে সাবলটার্ন শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। আর ইতিহাসবিদ রনজিৎ গুহের নেতৃত্বে বিংশ শতাব্দীর আশির দশকে ভারতীয় উপমহাদেশে 'সাবলটার্ন গোষ্ঠী' নামে একটি চর্চার সূত্রপাত হয়; এরই সঙ্গে সাবলটার্ন শব্দের বাংলা পরিভাষা হিসেবে নিম্নবর্গ শব্দটির বিস্তার ঘটে। নিম্নবর্গ শব্দের সঙ্গে সম্পৃক্ত সমার্থক শব্দ গুলি হল— প্রান্তিক, দলিত, অন্ত্যজ, অচ্ছুৎ, অস্পৃশ্য, অপাংক্তেয়, ব্রাত্য প্রভৃতি। এর বিপরীত দিকে রয়েছে সমাজের প্রভাবশালী শ্রেণি, ক্ষমতাকেন্দ্রিক গোষ্ঠী, শাসক শ্রেণি; এই দুই শ্রেণির সংঘাতেই পৃথিবী আজ ভয়ংকর অস্থিরতার মধ্যে নিমজ্জিত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

"ক্ষুধাতুর আর ভুরিভোজীদের
নিদারুণ সংঘাতে
ব্যাপ্ত হয়েছে পাপের দুর্দহন
সভ্যনামিক পাতালে যেথায়
জমেছে লুঠের ধন
যদি এ ভুবনে থাকে আজও তেজ
কল্যানশক্তির
ভীষণযজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত
পূর্ণ করিয়া শেষে
নূতন জীবন নূতন আলোক
জাগিবে নূতন দেশে।"[৩]

সমাজ ও মানব জীবনের অতীত বর্তমান-ভবিতব্য নিয়েই সাহিত্যের কারবার। আর সমাজভাষিক অর্থে নিম্নবর্গ বিষয়টি বাংলা সাহিত্যের সূচনা লগ্ন থেকেই বর্তমান। প্রাচীনকালের চর্যাপদ থেকে বর্তমানকালেও নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবনযাপন চিত্র সাহিত্যে নানা আঙ্গিকে উঠে এসেছে। বিশেষত মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যের ধারায় নিম্নবর্গের মানুষজনকে সামনে রেখে মানবমহিমার জয়গান ঘোষিত হয়েছে। মঙ্গলকাব্যিক সমাজ কেবল দেব-দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের সাহিত্য ছিলনা; এর অন্তর্গত ছিল সমাজ ব্যবস্থার গভীর দ্বান্দ্বিক প্রতিফলন। বিশেষত 'মনসামঙ্গল' কাব্যে দেবী মনসার স্বর্গরাজ্যে স্বীকৃতি অর্জনের লড়াই আসলে সমাজের অবহেলিত ও প্রান্তিক মানুষের স্বীকৃতি লাভের রূপক। মনসা এখানে কেবল সর্পদেবী নন; তিনি নারীশক্তি, অবদমিত সমাজগোষ্ঠী এবং নিম্নবর্গীয় মানুষের অধিকার চেতনার প্রতীক। অন্যদিকে চান্দ সদাগর প্রভাবশালী, উচ্চবর্ণীয়,

ক্ষমতাকেন্দ্রিক ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রতিনিধি। ফলে মনসা ও চান্দের দ্বন্দ্ব প্রকৃতপক্ষে দুই ভিন্ন সামাজিক শক্তির সংঘাত— একদিকে আধিপত্যবাদী উচ্চবর্গশ্রেণি, অন্যদিকে স্বীকৃতিবঞ্চিত নিম্নবর্গীয় মানুষ।

আধুনিক বাংলা নাট্য সাহিত্যের ধারায় এই মঙ্গলকাব্যিক ঐতিহ্য নতুন ব্যাখ্যা ও সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ লাভ করেছে। আধুনিক নাট্যকারেরা লোক ঐতিহ্যকে পুনরনির্মাণ করে সমকালীন সমাজ বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত করেছেন। দক্ষিণ আসামের বিশিষ্ট নাট্যকার শেখর দেবরায়ের রচিত 'মনসাকথা' বাংলা নাট্যসাহিত্যে লোকঐতিহ্য ও সমাজবাস্তবতার এক অনন্য সংলাপ রচনা করেছে। এই নাটকে তিনি কেবল মনসামঙ্গল-এর পৌরাণিক আখ্যানের পুনর্কথন করেননি; বরং লোকনাট্যের অভিনয়রীতি, আঞ্চলিক ভাষা, গায়েন-দোহার, ভাটিয়ালি সুর, লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান এবং প্রান্তিক মানুষের জীবন-অভিজ্ঞতাকে সৃজনশীলভাবে একসূত্রে গেঁথে বহুমাত্রিক নাট্যবিশ্ব নির্মাণ করেছেন। পৌরাণিক কাহিনির অন্তরালে তিনি উন্মোচন করেছেন সমাজের শ্রেণিবিভাজন, ক্ষমতার রাজনীতি, বর্ণবৈষম্য, লিঙ্গ-অসাম্য এবং নিম্নবর্গীয় মানুষের স্বীকৃতি ও আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ সংগ্রাম। ফলে মনসাকথা কেবল একটি পৌরাণিক নাটক নয়; এটি সমকালীন সমাজবাস্তবতার আলোকে পুনর্নির্মিত এক গুরুত্বপূর্ণ সমাজ-রাজনৈতিক দলিল। এই প্রেক্ষাপটেই বর্তমান নিবন্ধে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে শেখর দেবরায়ের মনসাকথা নাটকের অন্তর্নিহিত শ্রেণিদ্বন্দ্ব, ক্ষমতাকাঠামো এবং নিম্নবর্গীয় মানুষের কণ্ঠস্বরের বহুমাত্রিক প্রকাশ বিশ্লেষণের প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে।

(২)

শেখর দেবরায়ের 'মনসা কথা' নাটকে চান্দ সদাগর কেবল একজন ধনী বণিক নন; তিনি মধ্যযুগীয় সমাজের উচ্চবর্ণীয়, পুরুষতান্ত্রিক এবং ক্ষমতাকেন্দ্রিক সামাজিক কাঠামোর প্রধান প্রতিনিধি। নাটকে তার চরিত্রের মধ্য দিয়ে এমন এক সমাজব্যবস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে, যেখানে ধর্মীয় আধিপত্য, বর্ণভেদ, সামাজিক মর্যাদা এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতা একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। চান্দের ব্যক্তিসত্তা তাই কখনোই নিছক ব্যক্তিগত নয়; বরং তিনি একটি নির্দিষ্ট সামাজিক শ্রেণির মানসিকতা ও আধিপত্যবাদী চেতনার প্রতীক।

নাটকের শুরু থেকেই দেখা যায়, চান্দ সদাগর নিজেকে "সমাজপতি" হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। তার সমস্ত আচরণে উচ্চবর্ণীয় অহংকার এবং ক্ষমতার দম্ভ স্পষ্ট। চান্দ সদাগর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, সমাজে কোন দেবতা মান্য বা অমান্য হবেন, সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার কেবল ক্ষমতাবান সমাজপতিরই। এই ক্ষমতাকেন্দ্রিক মানসিকতার কারণেই তিনি কখনো মনসাকে দেবী হিসেবে স্বীকার করতে রাজি হন না; বরং ইচ্ছাকৃতভাবে তাকে 'চেঙ্গমুড়ি কানী', 'ঢ্যামনা ভাতারী' প্রভৃতি অবমাননাকর বিশেষণে আঘাত করেন। এই ভাষা কেবল ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বা ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ নয়; বরং এর মধ্যে উচ্চবর্ণীয় ব্রাহ্মণ্যবাদী ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার গভীর শ্রেণি-অহংকার এবং নারী ও নিম্নবর্গীয় মানুষের প্রতি দীর্ঘদিনের অবজ্ঞা ও বঞ্চনার মানসিকতা প্রতিফলিত হয়েছে। মনসাকে অবমাননা করার মধ্য দিয়ে আসলে চান্দ সমগ্র প্রান্তিক সমাজ, তাদের সংস্কৃতি, বিশ্বাস এবং আত্মপরিচয়কেই অস্বীকার করতে চান। ফলে এই ভাষা কেবল একটি চরিত্রের সংলাপ নয়; এটি ক্ষমতাকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থার নিপীড়নমূলক মানসিকতারও প্রতীকী প্রকাশ।

মনসা যখন প্রশ্ন তোলে— "দরিয়ার নোনা পানিতে যখন মাঝিমাল্লাগোর ঘাম ঝরে, কই তখন তো লঘু জাতি বইল্যে তাগোরে গালি দিস না"[৪] তখন চান্দের প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি সরাসরি ঘোষণা করে— "আমার ডিঙ্গার মাঝি যে অইব-তারে আমার মতেই চলতে অইব। আমার রাইজ্যে তোর নামে কোন পূজা পাঠ গান বাদ্যি করতে দিমু না।"[৫]

এই বক্তব্যে উচ্চবর্ণীয় ক্ষমতাকাঠামোর প্রকৃত রূপ উন্মোচিত হয়। চান্দ শ্রমজীবী মানুষদের অর্থনৈতিক কাজে ব্যবহার করতে দ্বিধা করেন না; কিন্তু তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস, সাংস্কৃতিক পরিচয় কিংবা আত্মমর্যাদাকে

স্বীকৃতি দিতে নারাজ। অর্থাৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিম্নবর্গ প্রয়োজনীয়, কিন্তু সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে তারা অগ্রহণযোগ্য। এই দ্বৈত মানসিকতাই সামন্ততান্ত্রিক ও উচ্চবর্ণীয় সমাজব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

চান্দের ক্ষমতার মূল উৎস তার অর্থনৈতিক শক্তি। চৌদ্দ ডিঙ্গার বিপুল বাণিজ্য, বিদেশে পণ্য রপ্তানি এবং বিপুল ধনসম্পদ তাকে সমাজের কেন্দ্রস্থলে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু এই অর্থনৈতিক আধিপত্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সামাজিক ও ধর্মীয় কর্তৃত্ব। তাই তিনি নিজেকে কেবল ধনী ব্যক্তি হিসেবে নয়, বরং "চম্পকের সমাজপতি" হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত। নাটকে বারবার তিনি এই পরিচয়কে সামনে আনেন। যেমন লখিন্দরের মৃত্যুর পরও তিনি ঘোষণা করেন— "আমি বাবা যোগেশ্বরের দীন দাস— একদিকে যেমন আমি পুতের বাপ—আরেকদিকে তেমনি সমাজপতি।"[৬]— এখানে পিতৃস্নেহের চেয়ে সামাজিক মর্যাদাকে তিনি বেশি গুরুত্ব দেন। ব্যক্তিগত শোকের মধ্যেও তার মূল চিন্তা সমাজের রীতি ও কর্তৃত্ব বজায় রাখা। ফলে মানবিক অনুভূতির চেয়ে সামাজিক ক্ষমতাই তার কাছে মুখ্য হয়ে ওঠে।

চান্দের চরিত্রে উচ্চবর্ণীয় পুরুষতন্ত্রও গভীরভাবে উপস্থিত। তিনি নারীকে কখনো সমান মর্যাদা দিতে শেখেননি। মনসার প্রতি তার বিরোধের মূলেও এই পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা কাজ করে। তিনি মনে করেন, একজন নারীদেবীর কাছে মাথা নোয়ানো তার সামাজিক মর্যাদার অবমাননা। তাই তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন— "বীরপুরুষের ধর্ম অতিছে, মরি তো মরব-কিন্তু যেইটা ঠিক বল্যে ভেবেছি তা পালন করব।"[৭] এই "বীরপুরুষ" পরিচয়ের মধ্যে লুকিয়ে আছে পুরুষ-অহংকার। মনসা দেবী হিসেবে নয়, বরং নারীসত্তার প্রতিনিধিত্বকারী এক শক্তি হিসেবে তার কাছে অগ্রহণযোগ্য। আবার বেহুলার ক্ষেত্রেও চান্দের আচরণ একইরকম কঠোর ও ক্ষমতাকেন্দ্রিক। লখিন্দরের মৃত্যুর পরে তিনি মানবিক সহমর্মিতা না দেখিয়ে বলেন— "চেঙ্গমুড়ি কানীর উচ্ছিষ্ট লখাইরে গাঙ্গুড়্যার পানিতে ভাসাইয়ে দাও।"[৮]

এই নির্দেশে একদিকে যেমন মনসার প্রতি ঘৃণা রয়েছে, তেমনি রয়েছে নারীর আবেগ ও মানবিকতার প্রতি অবজ্ঞা। কিন্তু বেহুলা যখন স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে যাত্রা করার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন চান্দ সরাসরি বাধা দেন। কারণ তার কাছে সমাজবিধানই চূড়ান্ত সত্য। তিনি বলেন— "সমাজ বিধানে এমন অনুমতি আমি দেই নাই— দিবার পারি না।"[৯] —এখানে সমাজবিধান আসলে উচ্চবর্ণীয় পুরুষশাসিত নিয়মব্যবস্থারই প্রতীক। নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার সেখানে স্বীকৃত নয়।

চান্দ সদাগরের ধর্মীয় অবস্থানও উচ্চবর্ণীয় ব্রাহ্মণ্যবাদী মানসিকতার প্রকাশ। তিনি নিজেকে "শিবভক্ত" হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন এবং মনে করেন শিবপূজার অধিকারী হাত অন্য কোন দেবতাকে স্পর্শ করতে পারে না। নাটকের শেষাংশে মনসাকে বাধ্য হয়ে পূজা দিতে গেলেও তিনি চাতুর্যের আশ্রয় নেন—

"শিবলিঙ্গ আমি পূজি সর্বদা যে হাতে,
সেই হাতে মনসারে পূজিব কি মতে।"[১০]

এরপর তিনি বাম হাতে পুষ্প অর্পণ করেন। এই দৃশ্য অত্যন্ত প্রতীকী। বাহ্যিকভাবে তিনি মনসাকে স্বীকার করলেও অন্তরে তার উচ্চবর্ণীয় অহংকার অটুট থাকে। অর্থাৎ ক্ষমতাকাঠামো সহজে বদলায় না; তা আপস করে, কৌশল নেয়, কিন্তু নিজের শ্রেষ্ঠত্ববোধ ধরে রাখে।

চান্দের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল তার সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ। তিনি কেবল ধর্মীয় পূজাই নিষিদ্ধ করতে চান না; মনসার নামে "গান বাদ্যি" পর্যন্ত বন্ধ করে দিতে চান। অর্থাৎ নিম্নবর্গের সাংস্কৃতিক প্রকাশও তার কাছে বিপজ্জনক। কারণ সংস্কৃতি মানুষের চেতনা জাগায়, ঐক্যবদ্ধ করে এবং প্রতিবাদের ভাষা তৈরি করে। তাই চান্দ জানে, মনসার গান ছড়িয়ে পড়া মানে প্রান্তিক মানুষের আত্মপরিচয়ের বিস্তার।

তবে নাটকের শেষদিকে দেখা যায়, চান্দের এই কঠোর ক্ষমতাকাঠামোতে ফাটল ধরতে শুরু করেছে। মাঝি-মাল্লা, সাধারণ মানুষ, এমনকি তার নিজের স্ত্রী সনকাও তার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলে। সনকা কাঁদতে কাঁদতে বলে— “তুমি সমাজপতি অইয়ে বুকে পাথর বাইন্ধবার পার—কিন্তু আমি যে মা!”[১১] এই সংলাপ মানবিকতার সঙ্গে ক্ষমতার দ্বন্দ্বকে স্পষ্ট করে। সমাজের মানুষও বলতে শুরু করে— “মা মনসারে মাইন্যতা দিতি তুমার এত আপত্তি ক্যান?”[১২] অর্থাৎ চান্দের একচ্ছত্র আধিপত্য আর অটুট থাকে না। জনগণের সম্মিলিত চাপে শেষ পর্যন্ত তাকে মনসাকে পূজা দিতেই হয়। যদিও সেই পূজা “বাম হাতের পূজা”, তবুও এটি উচ্চবর্ণীয় ক্ষমতাকাঠামোর প্রথম পরাজয়ের প্রতীক।

অতএব, ‘মনসা কথা’ নাটকে চান্দ সদাগর কেবল পৌরাণিক চরিত্র নন; তিনি এক ঐতিহাসিক সামাজিক শক্তির প্রতিরূপ। তার চরিত্রে উচ্চবর্ণীয় শ্রেণি-অহংকার, পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা, ধর্মীয় আধিপত্য, সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণ এবং সামাজিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভূত রূপ স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। মনসা, বেহুলা এবং নিম্নবর্গীয় মানুষের সম্মিলিত প্রতিরোধের মুখে এই ক্ষমতাকাঠামো ধীরে ধীরে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। ফলে চান্দ সদাগরের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, নাটকটি আসলে উচ্চবর্ণীয় সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রান্তিক মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার এক গভীর সামাজিক দলিল।

(৩)

শেখর দেবরায়ের বিনির্মাণ বিশ্বে সর্পদেবী মনসা সমাজ জীবনের অবহেলিত, বঞ্চিত, শোষিত, উপেক্ষিত এবং অধিকারহীন নারী তথা মানুষের প্রতীক রূপে চিত্রিত হয়েছে। মনসার দেবীত্বের আড়ালে ফুটে উঠেছে দীর্ঘকালের স্বীকৃতি বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ইতিহাস। সমাজের প্রভুত্ত্বধারী উচ্চবর্গরা যাদের ‘লঘুজাতি’, ‘অস্পৃশ্য’ বলে হেয় করেছে, মনসা তাদেরই প্রতিনিধি। ফলে মনসার দেবীত্ব অর্জনের লড়াই হয়ে উঠেছে অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। এই অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার উপরেই নিহিত রয়েছে সমাজ পরিবর্তনের বার্তা। তাই মনসা নিজের অপমানকে ব্যক্তিগত আঘাতের ঊর্ধ্বে সমগ্র সমাজের অপমান বলে মনে করেন। মনসা বেহুলাকে বলেন—

> “চম্পকের দণ্ডমুণ্ডের অধীশ্বর আমারে চেঙ্গমুড়ি কানী বইল্যা যে কুকথা কয়, সে তো আমারে নয়, আমার সমাজরে, আমার রীতি-রেওয়াজরে আর মাইয়্যা মাইনষেরে। তাই তো সমাজপতিরে বুঝাইয়া দিলাম-আমি যেমন নাগবংশের মাইন্যতা আদায় করতে চাই-তেমনি চাই পুরুষ বইল্যা চান্দের দম্ভের বিনাশ।”[১৩]

—উক্ত সংলাপেই স্পষ্ট হয় যে তিনি বৃহত্তর সমাজের প্রতিনিধি। আর অপমান মানে নিম্নবর্গীয় সংস্কৃতির অপমান, নারী জাতির অপমান এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আত্মপরিচয়ের অপমান। তাই মনসার লড়াই ব্যক্তিগত প্রতিশোধের স্তর অতিক্রম করে এক বৃহত্তর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছে।

নিম্নবর্গীয় মানুষেরা তথা মাঝি-মল্লারা মনসাকে ‘মা’ বলে ডাকে এবং আক্ষেপের সুরে বলে—

> “মা! মাগো! চক্ষু মেলি চাও! চেয়ে দেখ মা— আমরা চম্পক নগরীর লীলাই, দোলাই, জালু, মালু এয়েছি তোমার থানে— আরে হেই! — ধ্বনি দে, গলা তুইল্যা একসাথে সব্বাই বল জয়! মা মনসার জয়।”[১৪]

— এই ‘মাগো’ সম্বোধন কেবল আন্তরিকতা কিংবা ধর্মীয় বিশ্বাসের ইঙ্গিত নয়; তা প্রান্তিক মানুষের শান্তির-আশ্রয়ের প্রতীক। উচ্চবর্গীয় সমাজ যেখানে তাদের স্বীকৃতি দেয়না, সেখানে মনসা তাদের আত্মীয়তা, সান্তনা ও আশ্রয়ের স্থান হয়ে ওঠেন। তাই মনসা দেবীর পাশাপাশি নিম্নবর্গের নিজস্ব সংস্কৃতি ও চেতনার কেন্দ্র হয়ে উঠেছেন।

মনসা একাধারে সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতন একটি চরিত্র। সামাজিক স্তরে তিনি নিজের অবস্থান সম্পর্কে যেমন সচেতন, তেমনি রাজনৈতিক চেতনায় তিনি বুঝতে পেরেছেন কেবল শক্তি প্রয়োগের মধ্য দিয়ে সমাজ পরিবর্তন সম্ভব নয়। তাই তিনি মাঝিদের বলেন— "লড়াই করতি গেলে মাথা শেতল রাখতি অয়। কৌশল করি চলতি অয়।"[১৫]— এই সংলাপে প্রান্তিক মানুষের দীর্ঘ সংগ্রামের অভিজ্ঞতার চিত্র ফুটে উঠেছে।মনসা জানেন ক্ষমতাবানের বিরুদ্ধে সরাসরি সংগ্রাম সবসময় সম্ভব নয়; প্রয়োজন হয় কৌশল, ধৈর্য এবং সাংগঠনিক শক্তির। মনসা উপলব্ধি করেছেন চান্দকে হত্যা করলে তার সামাজিক স্বীকৃতি আসবেনা। তাই তিনি বলেন— "আমার আসল কথাটাই তো তোরা বুঝস নাই— আইজ যদি আমি সমাজপতিরেই মাইর্য়া ফেলি তো দুনিয়ার মাইনষে চিরকাল একটা কথাই জানব, চান্দ সদাগর মনসারে মানে নাই বইল্যা মারা পড়েছে। এমনতরো অইলে ঐ সমাজের কাছে আমাগোর জিত অইল কই? আরে বাছারা! যার সঙ্গে লড়াই সেই যদি না থাকে তে অইলে মাইন্যতা আদায় করমু কার কাছ থাইক্যা?"[১৬]— এই দীর্ঘ সংলাপে মনসা অসাধারণ রাজনৈতিক বোধের পরিচয় দিয়েছেন। তার লক্ষ্য ধ্বংস নয়, স্বীকৃতি। তিনি চান সমাজ তাকে মেনে নিক। অর্থাৎ তার সংগ্রাম মূলত সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ক্ষমতা অর্জনের সংগ্রাম।

নাট্যকার মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে মনসার সংগ্রামকে তুলে ধরেছেন। আপাতভাবে মনসাকে প্রতিহিংসাপরায়ণ মনে হলেও তার ক্রোধ আসলে দীর্ঘদিনের জমে থাকা অপমানের যন্ত্রণা ও অবহেলার বহিঃপ্রকাশ। তাই তিনি বলেন— "আমি যেমন নাগবংশের মাইন্যতা আদায় করতে চাই— তেমনি চাই পুরুষ বইল্যা চান্দের দম্ভের বিনাশ।"[১৭] — এই সংলাপে দু'টি বিষয় স্পষ্ট হয়— প্রথমত, তিনি নাগবংশ তথা প্রান্তিক মানুষের স্বীকৃতি চান; দ্বিতীয়ত, তিনি পুরুষ তান্ত্রিক আধিপত্যের বিরোধিতা করেন। ফলে মনসার চরিত্র একযোগে শ্রেণি, লিঙ্গ ও সামাজিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

শেষপর্যন্ত বেহুলার মাধ্যমে মনসার প্রকৃত বিজয় ঘটে। বেহুলার বক্তব্যে মনসার সংগ্রামের নতুন দিক উন্মোচিত হয়। বেহুলা মনসাকে বোঝায়— "মাইনসের মন যদি জয় করতে পার তে অইলে চম্পকনগরী তো বটেই বরং আন আন ঠাইয়ের মাইন্যজনেরাও কইব— চান্দ সাধু মন দিয়া বেহুলার কথা শোন—।"[১৮] —কেবল ভয় দেখিয়ে নয়, মানুষের মন জয় করার মাধ্যমেই প্রকৃত স্বীকৃতি অর্জন সম্ভব। তাই মনসা শেষে লক্ষিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে দেন। এখানে মনসার চরিত্রে দেবীত্বের চেয়ে মানবিকতা বড় হয়ে উঠেছে। এই সূত্রেই মনসা চান্দের বাম হাতের পূজাও স্বীকার করে নিয়েছেন অনায়াসে। তাইতো শেখর দেবরায়ের মনসা বহুমাত্রিক চরিত্রে পরিণত হয়েছে।

(৪)

'মনসাকথা' নাটকের মৌল আকুল্পই হল মনসা ও চান্দের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব সমাজের দুই বিপরীতধর্মী শক্তির সংঘর্ষের প্রতীক— উচ্চবর্গ বনাম নিম্নবর্গের লড়াই। চান্দ উচ্চ বর্গের প্রতিনিধি এবং মনসা নিম্নবর্গের প্রতিনিধি। নাটকে মাঝিমল্লাদের সমষ্টিগত চেতনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চান্দ যখন মনসার পূজার ভাড়া ভেঙে দিল, তখন মাঝিমল্লারা তাদের ধর্মের প্রতি এই অনাচার সহ্য করতে না পেরে চান্দের বাণিজ্য যাত্রায় ডিঙ্গার বৈঠা না নেওয়ার মত প্রকাশ করে। তখন ১ম মাঝির কণ্ঠে নিম্নবর্গীয় মানুষের দীর্ঘদিনের জমে থাকা জীবনযন্ত্রণার প্রকাশ ঘটে—

> "আমরা সহজ সরল মুখ্য সুখ্য মানুষ, জলা-জঙ্গলায় বড় অয়েছি, কষ্ট অইলেও মোদের দিন কেটেছে। এটা মানি, উত্তর দিশা থাইক্যা বণিক্যেরা আওনের পর এক এক বণিক্যের নামে এক এক ঘাট অইল! জেল্লা দেওয়া বাড়ি ঘর অইল! দেশ দেশান্তরের ডিঙ্গা আওন-যাওনা ধরল। আমরাও কাম-কাজ পাইতি লাগলাম-এই পাওনের লোভে পইড়্যা আমরা মনের খুশিতে বণিক্যগোর মর্জি মতন পরাণ পাত করে

ডিঙ্গার কাঁড়ার ধরেছি। দিন নাই-রাত নাই – কত ধনদৌলত এপার ওপার করেছি। তারপর – বুঝ বুদ্ধি হল, এজন সেজনের লগে কথা কইয়্যা বুঝলাম, নিজেগোর জানটা কার জন্য শেষ করছি! মোদের শরীরের ঘাম যত ঝরে- বণিক্যের দালান তত বাড়ে। হিসাব নিকাশের খাতাটা যখন খুলি- তখন দেখি, সদাগরেরা পূন্নিমের চান্দের মত উজলা অইতেছে- আর আমরা যেন সব্বাই ঢাকা পড়্যে আছি অমাবস্যির আন্ধাইরে-। 'মা গো! জোয়ার ভাঁটা জগতের নিয়ম! মোদের জীবনে জোয়ার কই? কেবল দেখি ভাঁটার টান। আগে অইত না, কিন্তু এখন মনে অয়, বণিক্যের দল বুঝি মোদেরে ঠকাচ্ছে। মুখে মা মনসার নাম লইয়্যে মোরা বুকে জোর পাই! কেউ যদি মোদের সেই ভাব ভক্তি নষ্ট করবার চায়- তা অইলে গো মা! তার উপর কি ভরসা রাখন যায়?"[১৯]

—কিন্তু নিম্ন বর্গীয়দের জীবন বড়ই কঠিন। তাদের জীবন সর্বদা দ্বৈত অবস্থানে বিরাজমান। গায়েনের বয়ানে এই টানাপোড়েনের চিত্রই বাস্তবিক পটে ধরা পড়েছে। মাঝি সনকার উদ্দেশ্যে বলে—

"মা গো! কাইন্দ্য না! তুমি মোদের সতী লক্ষ্মী – ভাসানে যাওনের আগে কইয়্যা যাই, এইবারের পাটনে আমরা চান্দ সাধুর লগ ছাড়ুম না।"[২০]

চান্দের সঙ্গে মনসার দ্বন্দ্ব একটি সামাজিক সংকট। চান্দের দম্ভের কারণে পরিবার ধ্বংস হয়, বাণিজ্য বিপর্যস্ত হয়, সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হয়। একসময় সাধারণ মানুষও চান্দের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে। গায়েন বলেন—

"সমাজপতির কথার লগে লগ না ধইর‍্যা মাঝিমাল্লারা যদি যে যার মত কইর‍্যা বাঁচতে চায়-তাতে সদাগরের ক্ষেতিটা কি? আইচ্ছা বাবুমশায়রা, আপনারাই বলেন। সদাগর ক্যান তার মাঝিগোর কথা বুঝতি চায় না! হু! হু! নিশ্চয় কোন যুক্তিতর্ক আছে। আচ্ছা গো বাবুমশায়রা! – পদ্মার পুরাণে পাই নানা জাতি কথা। কিন্তু কিছু কথা এই যুগের হাওয়াও দাঁড় করাইয়া দিছে। কেমন কইর‍্যা জানেন! এই যে আমি- আমার সমাজ, ধর্ম, আচার, আচরণ, আমার বুলি-বাইক্য, আমার গান বাদ্যি আমি বাঁচুম- এইটায় যদি কেউ বাধা দিবার চায় তে অইলে তো মহাবিপদ। পণ্ডিতমশাইরা কন-এইসব অইল একটা বিশাল বট বিরিক্ষির ছায়া। ভব নদীতে নিত্যদিন ডিঙ্গা বাইতে বাইতে মাইনষের যখন ঝিমুনি আসে-তখন তারা সেই বট বিরিক্ষির তলে বইস্যা শান্তি পায়। ঠাণ্ডা বাতাস যেমন দগ্ধ পরাণটারে জুইড়্যে দেয়, তেমনি সমাজ ধর্মের সেই বিশাল বিরিক্ষি মাইনষের মনে শান্তির জল ছিটাইয়া দেয়। মনটা হাল্কা অয়। জন্মের পর থাইক্যা যে বিরিক্ষির লগে আমাগোর চেনাজানা অয়, কেউ যদি তার শিকড় উপড়াইতে চায়-তে অইলে কি সেটা মাইন্যা লওন যায়? না কি মাইন্যা লওন উচিত? আপনারাই কন!"[২১]

—এই বয়ানে স্পষ্ট যে, শ্রেণিসংগ্রাম কেবল দুই ব্যক্তির সংগ্রাম নয়, এটি গোটা সমাজের স্থিতি ও শান্তিকে প্রভাবিত করে।

সামাজিক এই দ্বন্দ্বের মোড় ঘুরিয়ে দেয় বেহুলা। বেহুলা এই দ্বন্দ্বের গভীরতা বুঝতে পারেন। তাই তিনি মনসাকে বলেন—

"চম্পক নগরীর সমাজপতি একজন পুরুষ, সে তুমারে নারী বইল্যে অমান্যি করে। কিন্তু তুমারই নাম লইয়ে ঐ চম্পকের মাঝিমাল্লা যখন বণিক্যের ডিঙ্গা বোঝাই কইর্যে ধনসম্পদ লৈয়ে আসে তখন তা সিন্দুকে তুইল্যা থইতে মানে বাধে না।"[২২]

— বেহুলার এই সংলাপ শ্রেণিসংগ্রামের সঙ্গে লিঙ্গ-রাজনীতিকেও যুক্ত করে দেয়। অর্থাৎ মনসার বিরুদ্ধে চান্দের অবস্থান কেবল ধর্মীয় নয়, এটি নারী ও নিম্নবর্গের বিরুদ্ধে উচ্চ বর্ণীয় পুরুষের আধিপত্য। বেহুলা আরও বলেন—

> "দাবাইয়া রাখাই তেনার ধর্ম। সমাজ বিধানের নাম কইর‍্যে আমারেও তুমার কাছে আইতে মানা কইছিল–কিন্তু দিন তো বদলায়। আমার বিধবা জায়েরা যে বাক্যি সমাজ বিধান বইল্যে মাইন্যা নিছে–আমি তা মানুম ক্যান?"[২৩]

— এই সংলাপে শাসক শ্রেণির শোষণ নীতি চরম রূপ লাভ করেছে।

চান্দ শেষে মনসাকে বাম হস্তে পুষ্প দেন, যা শাসক শ্রেণির আংশিক আত্মসমর্পণ। চান্দ বলেন—

> "শিবলিঙ্গ আমি পূজি সর্বদা যে হাতে।
> সেই হাতে মনসারে পূজিব কি মতে।।"[২৪]

— এখানে চান্দের অহমিকা বোধ অটুট থাকলেও তিনি শেষ পর্যন্ত মনসাকে অস্বীকার করতে পারেননি। অর্থাৎ প্রান্তিক শক্তিকে আর সম্পূর্ণভাবে দমন করে রাখা সম্ভব হয়নি।

নাটকের শেষাংশে শ্রেণি সংগ্রামের রাজনৈতিক রূপটি মনসার কণ্ঠে আরও জোরালো রূপে প্রকাশিত হয়। মনসা স্পষ্ট ভাষায় বলেন—

> "বাম হাতের পূজা আদায় কইর‍্যা যে কাজটা শুরু অইয়েছে সেইটা চালাইয়া নিবা তুমরা, তুমরা। এই লড়াই কিন্তু শেষ হয় নাই–আরম্ভ করে একজন–শেষ করে অনেকজন।"[২৫]

— এই সংলাপ শ্রেণী সংগ্রামের ধারাবাহিকতার প্রতীক। সংগ্রাম এক চলমান প্রক্রিয়া; এটি কখনো একদিনে শেষ হয় না। মনসার জয় তাই কেবল দেবীর জয় নয়; তা নিম্নবর্গের মানুষের আত্মমর্যাদা ও অধিকার আদায়ের সংগ্রামের সূচনা।

(৫)

লোকভাষার মাধ্যমে নিম্নবর্গীয় চেতনার প্রকাশ 'মনসাকথা' নাটকের অন্যতম দিক। লোক্ভাষা মূলত মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত জীবন্ত ভাষা। দৈনন্দিন জীবনযাপন, শ্রম, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা ও অভিজ্ঞতার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ হল এই ভাষা। তাই এই নাটকের ভাষা কেবল সংলাপ নয়, এক সামাজিক দলিল। যেমন নাটকের শুরুতেই– 'আপনাগো', 'মাঝিমাল্লাগো', 'তাগোরে', 'কাউরে'– প্রভৃতি সম্বোধনসূচক শব্দচয়ন সরাসরি লোকমানুষের মুখের ভাষা। এখানে ভাষা কৃত্রিমভাবে পরিশীলিত নয়, বরং শ্রমজীবী মানুষের বাস্তব কথ্যরূপ। এই ভাষাই নাটকের শ্রেণিচেতনা নির্মাণ করে। কারণ উচ্চবর্ণীয় ক্ষমতাকাঠামো সাধারণত প্রমিত ভাষাকে 'সভ্য' ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে এবং লোকভাষাকে অবহেলা করে। শেখর দেবরায় সেই প্রথার বিপরীতে দাঁড়িয়ে লোকভাষাকে নাটকে শিল্পভাষায় পরিণত করেছেন।

মনসা, বেহুলা, মাঝিমাল্লা কিংবা গায়েন, দোহার–সকলেই এখানে লোকভাষায়, নিজের ভাষায় কথা বলে। তথাকথিত ধার করা 'সভ্য' ভাষায় তারা কথা বলে না। আসলে এই লোকভাষার মাধ্যমে নিম্নবর্গের মানুষ আত্মপরিচয় ঘোষণা করে। যেমন মনসা বলেন—

> "নায্যি পাওনা আদায়ের এই লড়াই শেষ না অইলে আমিও চুপ করুম না। দেইখ্যা লইমু, চম্পকের চান্দ সদাগরের কতখানি ক্ষ্যামতা–।"[২৬]

— এই প্রতিবাদী উচ্চারণ লোকভাষার শক্তিরই প্রকাশক। 'নায্যি পাওনা', 'চুপ করুম না', 'কতখানি ক্ষ্যামতা' –এই শব্দগুলো সরাসরি জনগণের আন্দোলনের ভাষা। এখানে ভাষা কেবল ভাব প্রকাশের উপকরণ নয়; তা প্রতিরোধের-প্রতিবাদের অস্ত্র।

নাটকে গায়েন একাধারে কাহিনি বর্ণনাকারী এবং জনগণের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর। তার ভাষা সম্পূর্ণ লোকজ ও ছন্দময়। যেমন—

"হৈ হৈ কইর‍্যা মাঝির দল ডিঙ্গায় চাপল।"[২৭] অথবা, "মনের জোর আর নিষ্ঠা থাকলি কি না করণ যায়!"[২৮] — এইসব সংলাপের মধ্যে গ্রামীণ জীবনের সহজ অথচ গভীর জীবনদর্শন প্রকাশ পেয়েছে। এমনকি নাটকের ভাটিয়ালি ও সারি গানও লোক ভাষার গুরুত্বপূর্ণ বাহন। যেমন মাঝিরা গাইছে—

"বন্ধু কই যাও রে, লহর দরিয়ার বুকে কুল নাই রে
কি দুক্ষ বুঝিবে বন্ধু কিনারায় দাড়াইয়া
ও বন্ধু – কুল নাই কিনারা নাই, উঠছে কত ঢেউ
এমন (অ) নিদান কালে সঙ্গী নাই তোর কেউ।"[২৯]

অথবা,

"আরে নাও যায়রে নাও যায় বাইয়া
আপনে সে দুর্গা মাইয়ে কাড়ার ধরিলা
হিরে হয় হয় হইয়া।।"[৩০]

— এই গান কেবল নাট্যরস সৃষ্টির জন্য নয়; এটি নদীনির্ভর নিম্নবর্গীয় শ্রমজীবী মানুষের সংস্কৃতির অংশ। নদী, নৌকা, বৈঠা, কাঁড়ার –এইসব শব্দ শ্রমজীবীদের জীবন বাস্তবতাকে বহন করে।

শেখর দেবরায়ের নাটকে লোকভাষা সামাজিক বিভাজনকেও স্পষ্ট করে তোলে। চান্দ সদাগরের ভাষা এবং মাঝিমাল্লাদের ভাষার মধ্যে উচ্চারণগত পার্থক্য থাকলেও নাট্যকার ইচ্ছাকৃতভাবে উভয়কেই লোকজ পরিসরে রেখেছেন। কারণ এই নাটকের মূল শক্তি অভিজাত ভাষা নয়, লোকসমাজের ভাষিক বাস্তবতা। চান্দের ভাষায় ক্ষমতার সুর বেশি। চান্দ মনসাকে বলে— "না। এ হতি পারে না–বিদেয় হ। চম্পকের সীমানা ছাইড়্যা এক্ষুণি চইলে যা! চেঙ্গমুড়ি কানী!"[৩১] অন্যদিকে মনসার অনুনয়ের ভাষায় বলে— "চান্দ! তাই আমারে নিত্য দিন গালি দিস্। কিন্তু এখন আমার কথা শোন,– ক্যান এইয়েছি আমি তোর কাছে! আমার নাগ পোলাপানেরা–তোর মাঝিমাল্লারা আমার পূজার্চনা করতে চায়, – তুই বাধা দিস্ না চান্দ।। শোন! তুই সমাজপতি! এই কথাটা জাইন্যা রাখ, যে যার মত কইর‍্যে বড় হতি পারলে। তবেই সমাজের হিত হয়। অন্যের ধর্ম-কর্ম, রীতি-নীতি সব কিছু মাইন্য করতি হয়। মনে কুটিলভাব রাইখ্যা যদি নিজের লাভের কড়ির হিসাব করিস–অহংভাব নিয়া যদি মাইনষেরে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিস–তা অইলে সেই সর্বনাশের জালে নিজেই আটকা পড়বি।"[৩২] অন্যদিকে মাঝিমাল্লাদের ভাষায় আনুগত্যের সঙ্গে ক্ষোভও রয়েছে— "মাগো! – আর কতদিন এমন কইর‍্যা চুপচাপ বইয়্যা থাকুম।"[৩৩]—এইভাষিক পার্থক্য নাটকের শ্রেণিবিন্যাসকে জীবন্ত করে তুলেছে। প্রতিবাদে, চেতনা প্রকাশে, শোক প্রকাশে, সর্বোপরি সামাজিক বিভাজনের নির্ণায়ক হিসেবে লোকভাষা এই নাটকে নিম্নবর্গীয়দের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছে।

সবশেষে বলা যায়, 'মনসাকথা' নাটকটি বাংলার লোকঐতিহ্যের আবরণে নির্মিত হলেও এর অন্তর্নিহিত বক্তব্য অত্যন্ত আধুনিক ও রাজনৈতিক। এখানে নিম্নবর্গীয় মানুষের সংগ্রাম, নারীচেতনার উন্মেষ, শ্রেণিসংঘাত, সাংস্কৃতিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং সামাজিক স্বীকৃতির দাবি একসূত্রে গাঁথা হয়েছে। নাট্যকার দেখিয়েছেন, সমাজের পরিবর্তন কখনো একদিনে আসে না; বরং দীর্ঘ লড়াই, প্রতিবাদ ও চেতনার মধ্য দিয়েই ইতিহাস এগিয়ে যায়। তাই নাটকের অন্তিম জয়ধ্বনি "জয় মা বিষহরি! জয় মা অমৃতনয়নী! জয় মা মনসা! জয় মনসার জয়!"[৩৪] — কেবল দেবীর বন্দনা নয়; এটি মূলত নিম্নবর্গীয় মানুষের আত্মমর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার চিরন্তন সংগ্রামেরই প্রতিধ্বনি।

তথ্যসূত্র:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। রাশিয়ার চিঠি, রবীন্দ্ররচনাবলী। জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ পঃ বঙ্গ সরকার, পৃ. ৬৭৫।

২. গুহ, রণজিৎ। নিম্নবর্গের ইতিহাস, 'নিম্নবর্গের ইতিহাস' (সম্পা: গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়)। আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৮, কলকাতা, পৃ. ৩৩।

৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। নবজাতক। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫২, কলকাতা, পৃ. ১৫।

৪. দেব, মলয় (সম্পা)। শেখর দেবরায়ের লোকঐতিহ্য আশ্রিত দু'টি নাটক মনসাকথা ও রইদ রাজার কিচ্ছা। গুটেনবার্গ, ২০২২, কলকাতা, পৃ. ৩৬।

৫. তদেব, পৃ. ৩৬।

৬. তদেব, পৃ. ৪৩।

৭. তদেব, পৃ. ৪২।

৮. তদেব, পৃ. ৪৩।

৯. তদেব, পৃ. ৪৪।

১০. তদেব, পৃ. ৫৫।

১১. তদেব, পৃ. ৫৪।

১২. তদেব, পৃ. ৫৩।

১৩. তদেব, পৃ. ৪৮।

১৪. তদেব, পৃ. ৩০।

১৫. তদেব, পৃ. ৪০।

১৬. তদেব, পৃ. ৪০।

১৭. তদেব, পৃ. ৪৮।

১৮. তদেব, পৃ. ৫০।

১৯. তদেব, পৃ. ২৬।

২০. তদেব, পৃ. ২৭।

২১. তদেব, পৃ. ২৮।

২২. তদেব, পৃ. ৪৯।

২৩. তদেব, পৃ. ৪৯।

২৪. তদেব, পৃ. ৫৫।

২৫. তদেব, পৃ. ৫৬

২৬. তদেব, পৃ. ৩৬।

২৭. তদেব, পৃ. ৩৮।

২৮. তদেব, পৃ. ৪৬।

২৯. তদেব, পৃ. ২১।

৩০. তদেব, পৃ. ৩৮।

৩১. তদেব, পৃ. ৩৩।

৩২. তদেব, পৃ. ৩৩।

৩৩. তদেব, পৃ. ৪০।

৩৪. তদেব, পৃ. ৫৬।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. দেব, মলয় (সম্পা)। শেখর দেবরায়ের লোকঐতিহ্য আশ্রিত দু'টি নাটক মনসাকথা ও রইদ রাজার কিচ্ছা। গুটেনবার্গ, ২০২২, কলকাতা।

২. গুহ, রণজিৎ। নিম্নবর্গের ইতিহাস, 'নিম্নবর্গের ইতিহাস' (সম্পা: গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়)। আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৮, কলকাতা।

৩. ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ। বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস। এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ২০২২, কলকাতা।